ভাষা আন্দোলন ও রাজরোষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ

মিলটন কুমার দেব

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookMilton

ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্রান্তিলগ্নে (চক্রবর্তী, ২০২২)। ১৯২১ সালের ১লা জুলাই যে কয়টি বিভাগ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে, তার মধ্যে ইতিহাস বিভাগ অন্যতম। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সর্বজনীন ও সকল প্রকার সংকীর্ণতামুক্ত শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান (দেব, ২০২৪)। আর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে সমাবেশ ঘটেছিল ভারত ও বাংলার মেধাবী, শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তিবর্গের। পাশাপাশি এখানে সম্মিলন হয় স্বাধীনতাকামী ও প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার অধিকারী যুবক সম্প্রদায়ের। তাই শুধু জ্ঞানের সুদীপ্ত মশাল জ্বালানোর মধ্যেই ইতিহাস বিভাগের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ ছিল না। এর চেতনার ধারালো তরবারি চমকিত হয়েছে জাতীয় প্রয়োজনে। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের ঘটনার সাথে যুক্ত একজন বিপ্লবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে হাজির হলে সে সময়ে ইতিহাস বিভাগের সভাপতি রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁকে উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে বলেন, “You are the maker of history, I am a mere writer.” (দেব, ২০২৪)। এ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসেবে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত মহান ভাষা আন্দোলনের দুটি পর্বেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের সদস্যগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের চরম আত্মত্যাগের ও স্বার্থত্যাগের মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষা আজ বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনামলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পূর্ব-বাংলার জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন সেখানকার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের বৃহত্তর জনমানুষের ভাষা হিসেবে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দানের জন্য যে মরণপণ সংগ্রাম সূচিত হয়, তার সাথে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের এক সুগভীর সম্পর্ক। ভাষা আন্দোলন নিয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হলেও এ আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের ভূমিকা, অবদান ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে সুসংবদ্ধ ও বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা নেই বললেই চলে।

উল্লেখ্য, বাংলা ভাষা নিয়ে পাকিস্তান গণপরিষদের সিদ্ধান্ত এবং এ সংক্রান্ত পাকিস্তান সরকার ও সরকারি দলের অন্যায় কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়ায় ১৯৪৮ সালের মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’। এ পরিষদের প্রতিষ্ঠালগ্নে ইতিহাস বিভাগের প্রথম মুসলমান ছাত্রী আনোয়ারা খাতুন অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া এ বিভাগের শিক্ষার্থী গাজীউল হক, হাবিবুর রহমান শেলী, জিল্লুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং শিক্ষক হিসেবে পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্তী ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। এজন্য তাঁদের সকলকে শিকার হতে হয় রাজরোষের এবং অনেককেই বরণ করতে হয় কারাবাস। এখানে ‘রাজ’ শব্দটি একটি বিশেষ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক সময়কাল হিসেবে উল্লিখিত, যার মূল চরিত্র হলো ক্ষমতা জাহির করা। ‘রাজ’-এর পরম কাঙ্ক্ষিত বিষয় হলো নিপাট আনুগত্য, অপ্রয়োজনীয় তোষামোদি

ও স্তাবকতা। এটি সকলেরই জানা যে, দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি হয় পাকিস্তান। ১৯৪০ সালে উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ (states) গঠনের লক্ষ্য থাকলেও সেখানে 'পাকিস্তান' নামের উল্লেখ ছিল না। পরবর্তী সময়ে মুদ্রণপ্রমাদের কথা বলে পাকিস্তান নামে একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এরপর সরকারি পর্যায়ে পূর্ববাংলার পাকিস্তানিকরণ প্রক্রিয়ার প্রতি দেয়া হয় বিশেষ প্রাধান্য। কিন্তু এ প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি ছাত্র-শিক্ষক। এই ছাত্র-শিক্ষক দেশমাতৃকাকে ভালোবাসতে গিয়ে সীমাহীন অত্যাচার ও দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। প্রবন্ধে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকের ঘটনা পৃথক কিন্তু সকলের রাজরোষের পটভূমি অভিন্ন। এ প্রবন্ধের দ্বারা সেসব রাজরোষের প্রামাণ্য দলিলও উপস্থাপনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

গাজীউল হক (১৯২৯-২০০৯)

১৯৪৮ সালে বগুড়া আজিজুল হক কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাস করে গাজীউল হক ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে, বিএ (সম্মান) শ্রেণিতে (সুলতান, ২০২০)। ১৯৫১ সালে তিনি সম্মানসহ স্নাতক পাশ করেন। সে-সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে গাজীউল হকের সরব উপস্থিতি ছিল। ১৯৫০ সালের প্রারম্ভে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়, যার উদ্যোগে ১১ই মার্চ পালিত হয় রাষ্ট্রভাষা দিবস। এ কমিটি ১১ই মার্চ, ১৯৫১ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়েও রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করে (সুলতান, ২০২০)। ইতিহাস বিভাগের ছাত্র গাজীউল হক এ সময়ে ভাষা আন্দোলনের প্রতিটি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। গাজীউল হক এ সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন:

> ১৯৫১ সালের মাঝামাঝি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ৫৪ নং ঘরে বৈঠক হয়। সেই কক্ষেই আমি থাকতাম। পাশের ৫২ নং ঘরে থাকতেন জনাব মাহবুব জামাল জাহেদি। তোয়াহা সাহেব, মাহবুব জামাল জাহেদি, আলী আহমদ, আব্দুস সামাদ মিলে ছোট ঐ বৈঠকে যুবলীগের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এবং তার কর্ম তৎপরতা সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। এখানে একটি বিষয়ে আমরা একমত হয়েছিলাম যে, ভাষার দাবির প্রশ্নে নিরবতা এবং আন্দোলন বিমুখতা কোনোটাই সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সহায়ক নয়। সুতরাং এ অবস্থায় পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। আমরা আরও ঠিক করেছিলাম যে, বাংলাভাষা আন্দোলনকে সামনে রেখে আমরা সক্রিয় হবো। অবশ্য বাংলা ভাষা আন্দোলন বুঝাতে তখন বুঝাতো ১১ই মার্চের আন্দোলন (হক, ২০০০)।

১৯৫২ সালে বাংলাভাষা আন্দোলন নতুন করে সংগঠিত হয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। ২৬শে জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দীনের দম্ভোক্তি 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'-এর প্রতিক্রিয়ায় ছাত্রদের মুখে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান উঠে আসে। সৃষ্টি হয় বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জ্বল এক অধ্যায়, বিশ্বমানবের উজ্জ্বল এক উত্তরাধিকার। ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী হরতালের কর্মসূচি নেওয়া হয়। গাজীউল হক তাঁর স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেন:

> যুবলীগের কর্মীদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফেব্রুয়ারি কর্মসূচি পালিত হলো। মিছিলবিরোধী পূর্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সদস্যরা যাতে কোনো প্রকার সুযোগ না পায় তার জন্য যুবলীগ ও অন্যান্য প্রগতিশীল ছাত্ররা বেশ তৎপর ছিলেন। মধুর রেস্তোরাঁ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় একটি ছোট টেবিল আনা হয়। এ সময় হাস্যকর দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। মধুর রেস্তোরাঁ থেকে টেবিল আনার পর চেয়ারের অপেক্ষা করছেন খালেক নেওয়াজ খান। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অন্য কর্মীরাও অপেক্ষা করছেন। চেয়ার এসে সভাস্থলে পৌঁছানোর আগেই এম আর আখতার টেবিলের

> ওপরে লাফিয়ে উঠে সভাপতি হিসেবে আমার নাম প্রস্তাব করে দিলেন। তিনি যখন সভাপতির নাম প্রস্তাব করছেন তার মতলব বুঝতে পেরে সৈয়দ নুরুল আলম এম আর আখতার মুকুলের প্যান্ট ধরে টেনে নামাবার চেষ্টা করছিলেন। এ টানা-হ্যাঁচড়ায় বেচারা মুকুলের প্যান্টের কয়েকটি বোতামই ছিঁড়ে যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও এম আর আখতার মুকুল সভাপতি হিসেবে আমার নাম প্রস্তাবের কাজ সমাধা করেন। এরপরেই পুরো ছয়ফুট লম্বা কামরুদ্দীন শহুদ পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে হেঁড়ে গলায় প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। ... আমি সভাপতির আসন নিলাম। চেয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে পারলাম না। টেবিলের ওপর লাফিয়ে উঠলাম এবং দুই মিনিট বক্তৃতা করেই মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করলাম (প্রথম আলো, ২০০২)।

২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ বেলা ৩টায় মধুর রেস্তোরাঁয় বসে আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেছিলেন গাজীউল হকসহ বেশ কয়েকজন। কারণ ভাষা আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন তা দমনে ১৯৫২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে সরকারি আদেশে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে সার্বিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা এবং ২১শে ফেব্রুয়ারির কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করার লক্ষ্যে ২০শে ফেব্রুয়ারি রাতে ৯৪, নবাবপুর রোডে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কার্যালয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া বহু ছাত্রনেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত দেন। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামত ছিল ১৪৪ ধারা ভাঙার বিপক্ষে। এ সংবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতে ক্ষুব্ধ ছাত্রবৃন্দ কয়েক দফা বৈঠক করেন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হলসহ ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণ পৃথক পৃথক বৈঠক করে ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ওই রাতে ১২টার দিকে ফজলুল হক হল ও ঢাকা হলের মধ্যবর্তী স্থানে যে পুকুর আছে, তার পূর্বধারে গাজীউল হকসহ নানাজন মিলিত হয়ে স্থির করেন যে, যে-কোনোভাবেই হোক তারা ১৪৪ ধারা ভাঙবেন (আনিসুজ্জামান, ২০১৫)। ২১শে ফেব্রুয়ারি ছিল আগুনঝরা ফাগুনের দিন। এদিন সকাল ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রগণ ঐতিহাসিক সভায় মিলিত হন। এতে সভাপতিত্ব করেন গাজীউল হক। এ সম্পর্কে গাজীউল হক লিখেছেন:

> সভাপতি হিসেবে আমি প্রথমে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে শামসুল হককে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাই। কিছু ছাত্র এতে বাধা দিলেও শেষ পর্যন্ত তিনি তার বক্তব্য রাখেন। জনাব হক বাগ্মী ছিলেন। চমৎকার বলতে পারতেন। ১৪৪ ধারা না ভাঙার পক্ষে তিনি যুক্তি উপস্থাপন করে ছাত্রদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু জনাব হকের কোনো যুক্তিই আমতলায় সমবেত ছাত্ররা মানতে রাজি ছিল না। দুয়েকজন অবশ্য তার বক্তব্যকে সমর্থন করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সম্মিলিত ছাত্রদের উত্তপ্ত বিক্ষোভের জন্য তা সম্ভব হয়নি। এরপর আবদুল মতিনকে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানানো হয়। আবদুল মতিন শান্তভাবে যুক্তি দিয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। সবশেষে সভাপতি হিসেবে আমি আমার বক্তব্য রাখি। আমার মনে পড়ে আমি বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। আমার সেদিনের বক্তব্যের সব কথা মনে পড়ে না। যুক্তির চেয়ে আবেগই ছিল বেশি। তবে মোটামুটিভাবে শেষাংশ বোধহয় এরকম ছিল, 'নূরুল আমীন সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে পুলিশ মোতায়েন করেছে। ১৪৪ ধারা ভাঙা হলে নাকি গুলী করা হবে – ছাত্রদের গুলী করে হত্যা করা হবে। আমরা নূরুল আমীন সরকারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি। ১৪৪ ধারা আমরা ভাঙব। আমরা দেখতে চাই নূরুল আমীন সরকারের বারুদাগারে কত বুলেট জমা আছে।' আমার বক্তৃতা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে থেকে ধ্বনিত হলো '১৪৪ ধারা মানি না, মানি না'। ঠিক এমনই সময় আবদুস সামাদ আজাদ চিৎকার করে বললেন, 'আমরা

> সত্যাগ্রহ করব এবং কীভাবে করব – কয়জন করে?' তিনি একটি প্রস্তাবও আনলেন ১০ জন ১০ জন করে সত্যাগ্রহ করা হবে, ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে। প্রস্তাবটি গৃহীত হলো। সত্যাগ্রহীরা শান্তিপূর্ণভাবে ভাষার দাবিতে শ্লোগান দিয়ে ভবনের দিকে যাবে (শেলী, ১৯৮০)।

মহান ভাষা আন্দোলন তথা একুশের স্মৃতিসুধায় গাজীউল হক লিখেছেন একুশের প্রথম গান:

ভুলব না, ভুলব না, সেই একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না
লাঠি-গুলি-আর টিয়ারগ্যাস, মিলিটারি আর মিলিটারি ভুলব না
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, এই দাবীতে ধর্মঘট
বরকত সালামের খুনে লাল ঢাকার রাজপথ
ভুলব না,
শহীদ স্মৃতি ভাঙ্গিয়াছে, জেগেছে পাষাণে প্রাণ
মোরা কি ভুলিতে পারি খুন রাঙা
জয় নিশান? (হক, ২০০০)।

এই গানটির ঐতিহাসিক মূল্য অশেষ। এখানে একুশ, মিলিটারি ও ভাষা-শহিদের প্রসঙ্গ এসেছে। এ গানটির একটি পঙ্‌ক্তি 'মোরা কি ভুলিতে পারি'র অনুকরণেই পরবর্তী সময়ে আবদুল গাফফার চৌধুরী লিখেছেন:

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি

ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে গাজীউল হকের সফল ভূমিকার কারণে তাঁকে রাজরোষের শিকার হতে হয়েছে। ১৯৫২ সালে ইতিহাস বিষয়ে এমএ ডিগ্রি লাভের পর ১৯৫৩ সালে তিনি আইনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হন। সে-বছরই ১৪ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার বছরের বহিষ্কারাদেশ দিয়ে তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। এখানেই শেষ নয়। কেড়ে নেওয়া হয় তাঁর এমএ ডিগ্রি। কিন্তু তীব্র ছাত্র-আন্দোলনের কারণে কর্তৃপক্ষ তাঁর ডিগ্রি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান শেলী (১৯২৮-২০১৪)

ইতিহাস বিভাগের কৃতী ছাত্র মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রথম মিছিলটি হয় তাঁরই নেতৃত্বে। আর এজন্য তাঁকে ভোগ করতে হয় রাজরোষ। ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত-পর্বের সময়ে তিনি ছিলেন ফজলুল হক হল সংসদের সহ-সভাপতি। ভাষা আন্দোলনে তিনি তাঁর সমসাময়িক ছাত্রনেতা গাজীউল হক, জিল্লুর রহমানসহ অন্যদের সাথে যোগদান করেন (রেজা, ২০০৪)।

১৪৪ ধারা প্রথম ভঙ্গ করার অপরাধে হাবিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়। তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে গাজীউল হক লিখেছেন:

> সে রাতে বৈঠকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। তা হলো আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দেবেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র হাবিবুর রহমান (শেলী) ছাড়া পারতপক্ষে কেউ গ্রেপ্তার বরণ করবেন না। আন্দোলনের স্বার্থের খাতিরে তাঁদেরকে বাইরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। কেননা, সর্বদলীয়

> রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই সংগ্রামী ছাত্র নেতাদের অংশটি আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে গ্রেফতার এড়িয়ে যাওয়া প্রয়োজন। হাবিবুর রহমান শেলীর বেলায় সিদ্ধান্তটি অন্যরকম। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সত্যাগ্রহী দলটি বের হবে তাদের মধ্যে প্রথম গ্রুপের বা ব্যাচের নেতৃত্ব দেবেন হাবিবুর রহমান শেলী। কারণ শেলী ছিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রদের একজন। তাঁর জীবনের যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে সে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে উপেক্ষা করে তিনি গ্রেফতার বরণ করবেন। মধ্যবিত্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের ভাষায় তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্মুখে। কিন্তু সেদিন বাংলা ভাষা আন্দোলনের স্বার্থে তিনি আমাদের সিদ্ধান্ত জেনে শুনে মেনে নিয়েছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে তাঁকে বহু ঝড় ঝাপটা পোহাতে হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের জন্য তিনি গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেন। জেল থেকে বের হয়ে আসার পর চাকুরির জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দরখাস্ত করলেন কিন্তু তাঁকে সে চাকুরী দেয়া হলো না। তার প্রতিবাদে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে তিন দিন পান সিগারেটের দোকান সাজিয়ে দোকানদারী করেছিলেন। বাংলা ভাষা আন্দোলনে সেই ২১শে ফেব্রুয়ারিতে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা বিশেষভাবে স্মরণীয় (চক্রবর্তী, ২০১৫)।

হাবিবুর রহমান কর্তৃক ১৪৪ ধারা ভেঙে প্রথম মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার তথ্য বদরুদ্দীন উমরও জানিয়েছেন:

> ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত এভাবে ঘোষিত হওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তেজিত হয়ে '১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে। এই সময় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পদ্ধতি নির্ধারণ করে স্থির হয়ে যে, দশ জন করে এক এক ব্যাচে ছাত্র ছাত্রীরা বের হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে হবে, অন্যথায় সকলে একসঙ্গে বের হতে চাইলে চারদিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাবিবুর রহমান শেলীর নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী প্রথম দলটি গেট থেকে রাস্তায় বের হয় (মাহবুবউল্লাহ, ২০০৮)।

উল্লেখ্য, হাবিবুর রহমানের মধ্যে দেশের জন্য কল্যাণচিন্তা ছিল সদা তৎপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে পড়াকালীন তাঁর নিজের মানস নিয়ে তিনি লিখেছেন:

> লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও ছাত্রসমাজে যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠতো তখন চুপচাপ না থেকে সরাসরি সাড়া দিতাম। উপনিবেশবাদ, ভিয়েৎনাম, বর্ণবৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা, পূর্ববাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও ছাত্রদের দাবী-দাওয়া ইত্যাদি ছোট বড় সব ব্যাপারে নিজস্ব একটা বক্তব্য রাখার প্রেরণা অনুভব করতাম। ছোটখাটো সব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে না পারলে নিজেকে অপরাধী মনে হতো। ফরাসি শব্দ 'আগাঁজে' (বাংলা শব্দ 'নিয়োজিত' না 'নিবেদিত' হবে?) বলতে যা বুঝায় মনের অবস্থা ছিল তাই। মনে হতো যেন সারা পৃথিবীটা আমাকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করছে। সকল সমস্যার আশু সমাধান সন্নিকটে। কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠার একটা অস্পষ্ট ধারণা মাথার ভিতরে পাক খেতো। নিজেকে প্রগতিবাদী বলে পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করতাম (রহমান, ২০০৮)।

১৪৪ ধারা ভাঙ্গার কারণে ২১শে ফেব্রুয়ারি হাবিবুর রহমানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠায়। ১১ই মার্চ তিনি কারামুক্ত হন। কয়েকসপ্তাহ পর রাজশাহী থেকে ঢাকায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজে জানিয়েছেন:

> পয়লা মে আমার শিক্ষক, প্রফেসর হালিম সাহেবের আমন্ত্রণে ইতিহাস বিভাগে অস্থায়ী লেকচারার পদে যোগদান করি। আমার হাজতবাসের কথা উল্লেখ করে ভাইস চ্যান্সেলরের শীঘ্রই কান ভারী

> করা হয়। কোন কোন সহযোগী আমাকে বিশেষ বর্ণে রঞ্জিত করে ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে অভিযোগ করেন। ৪ঠা মে প্রফেসর হালিম আমাকে ডেকে সব কথা বললেন। তাঁকে চিন্তান্বিত দেখে আমার খারাপ লাগল। আমি বললাম ‘আমার জন্য যদি আপনার ইউনিভার্সিটির কোন অসুবিধা হয়, তবে আমি পদত্যাগ করছি। অনুরূপ ভাষায় তাঁকে একটি পদত্যাগ পত্র দিলাম। ভাইস চ্যান্সেলর ড. মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেব অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন (আহমদ, ২০১৪)।

এরূপ বৈরী পরিস্থিতিতে হাবিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের লেকচারার পদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি কামনা করে উপাচার্যের নিকট যে চিঠি দেন, তাতে উল্লেখ ছিল:

> I have the honour to state that I joined my duty as a Lecturer in the Department of History on the 1st may, 1952. I beg to state now that if the University or the Department of History is put any difficulty on account of my appointment, I tender my resignation from today or any day thereafter which may be conveniant to you. (Record Room, DU).

ভাষা আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকার জন্য হাবিবুর রহমানকে যথেষ্ট রাজরোষের মুখোমুখি হতে হয়েছে। ছাত্রজীবনের প্রতিটি স্তরে উজ্জ্বল মেধার স্বাক্ষর রাখলেও তাঁর প্রতিভা বিকাশের পথ বহুলাংশে রুদ্ধ হয়েছিল শুধু ভাষা আন্দোলনে যোগদানের কারণেই। রাজরোষের শিকার হাবিবুর রহমান মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় জাতীয় জীবনের ক্রান্তিলগ্নে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। পরে আবার দেশের নানা কলেজে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষকতা করেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম (১৯২৫-১৯৭৫)

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ থেকে ১৯৪৬ সালে বিএ (সম্মান) এবং ১৯৪৭ সালে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫৩ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এলএলবি ডিগ্রিও লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই সৈয়দ নজরুল ইসলাম রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনকালে গঠিত সর্বদলীয় অ্যাকশন কমিটির সদস্য হিসেবে ভাষা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন (হোসেন ও ইসলাম, ২০২২)। ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে আয়োজিত একটি সভায় পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ, গণ আজাদী লীগসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে গঠিত কমিটিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামও ছিলেন।

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পূর্ববঙ্গ সফরের কর্মসূচি এগিয়ে আসায় সরকারের পক্ষ থেকে আন্দোলন থামানোর কৌশল বের করা হয়। এরই অংশ হিসেবে ১৫ই মার্চ পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ৮ দফা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্ধমান হাউসে অনুষ্ঠিত ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন নাইমউদ্দীন আহমদ, আবদুর রহমান চৌধুরী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং আজিজ আহমদ। তাঁরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম এবং কামরুদ্দীন আহমদ। সেদিনের বেঠক নিয়ে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন:

> নির্ধারিত সময়ে নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে আলোচনার জন্য সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে কামরুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবুল কাসেম, নঈমুদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আজিজ

> আহমদ প্রমুখ বর্ধমান হাউসে উপস্থিত হন।... নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে সংগ্রাম পরিষদের এই আলোচনা বৈঠকে তুমুল বিতর্ক এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ... দীর্ঘ সময় স্থায়ী এই বৈঠকে উভয় পক্ষের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়, কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা তাঁদের দাবীতে অনমনীয় থাকায় নাজিমুদ্দীন শেষপর্যন্ত তাঁদের সবকটি দাবীই মেনে নিতে বাধ্য হন। তবে ৮ দফা চুক্তিটির শেষ দফাটি কিছু রদবদল করে নাজিমুদ্দীন স্বহস্তে সেটি নতুনভাবে লিখে দেন (মাহবুবউল্লাহ, ২০০৮)।

সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সাথে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের ৮ দফা চুক্তি ছিল নিম্নরূপ:

১. ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাঁহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দান করিতে হইবে।

২. পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে বিবৃতি প্রদান করিবেন।

৩. ১৯৪৮-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারি আলোচনার জন্যে যেদিন নিধারিত হইয়াছে সেই দিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাদিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্যে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪. এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে, প্রদেশের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজী উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল-কলেজগুলোতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হইবে।

৫. আন্দোলনে যাঁহারা অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৬. সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

৭. ২৯ ফেব্রুয়ারি হইতে পূর্ববাংলার যেসকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে সেখান হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

৮. সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই (অমৃতবাজার, ১৯৪৮)।

চুক্তির শর্ত মেনে ১৫ই মার্চ কারাবন্দিদের মুক্তি দেওয়া হয়। ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় এক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান এতে সভাপতিত্ব করেন। ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া জিন্নাহর ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় ছাত্ররা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এদিন সন্ধ্যায় পূর্ব-পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদের সরকারি বাসভবনে জিন্নাহর সাথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যে সভা হয়, তাতে সৈয়দ নজরুল ইসলামও অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন (জাগরণ, ২০২১)। এ সভায় জিন্নাহর হাতে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সভাটি শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়নি। পরিষদ নেতৃবৃন্দের সাথে জিন্নাহর তর্ক-বিতর্ক হয়।

এ সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন:

> রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধিদেরকে জিন্নাহ ২৪ মার্চ সন্ধ্যায় সাক্ষাৎ দান করেন। এই সাক্ষাতের সময় সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শামছুল হক, কামরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাসেম, তাজউদ্দিন আহমদ, লিলি খান, মোহাম্মদ তোয়াহা, আজিজ আহমদ, নঈমুদ্দিন আহমদ, শামসুল আলম, অলি আহাদ এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম। আলোচনার প্রথমেই জিন্নাহ তাঁদেরকে বলেন যে, নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে তাঁদের যে চুক্তি হয়েছে সেটাকে তিনি স্বীকার করেন না। কারণ নাজিমুদ্দীনের কাছ থেকে জোরপূর্বক সেই চুক্তিতে সই আদায় করা হয়েছে। তিনি এসময় দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদেরকে জানান যে, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এই সাক্ষাৎকারের সময় উভয়পক্ষে অল্পক্ষণের মধ্যেই তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হলে জিন্নাহ আর আলোচনা করতে অসম্মত হওয়ায় সাক্ষাৎকারটি নির্ধারিত সময়ের আগেই আকস্মিকভাবে সমাপ্ত হয় (মাহবুবউল্লাহ, ২০০৮)।

মো. জিল্লুর রহমান (১৯২৯-২০১৩)

মো. জিল্লুর রহমান ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ থেকে বিএ (সম্মান) এবং ১৯৫৪ সালে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনে তাঁর ছিল সক্রিয় অবদান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় ১৯৫২ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংঘটিত ছাত্র-সমাবেশে জিল্লুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। এ সমাবেশ সম্পর্কে ভাষাসৈনিক গাজীউল হক লিখেছেন:

> ১৯ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্রসভা ডাকা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জিল্লুর রহমান। সেই ছাত্রসভায় 'বিশ্ববিদ্যালয় রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলন কমিটি' নামে ১৭/১৮ জন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক করা হয় আমাকে (গাজীউল হক), 'রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলন কমিটি'র সেই প্রথম সভায় যাঁরা বক্তৃতা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন: জিল্লুর রহমান, নাদিরা বেগম এবং শামসুল হক চৌধুরী (হাফিজ, ২০১৭)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে গঠিত এ কমিটিই ছিল প্রথম 'রাজবন্দি মুক্তি আন্দোলন কমিটি'। ২০শে ফেব্রুয়ারি ফজলুল হক হল ও ঢাকা হলের মাঝখনের পুকুরপাড়ে যে ১১ জন ছাত্রনেতার নেতৃত্বে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, জিল্লুর রহমান ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি নিয়ে তিনি লিখেছেন:

> একটি ঘটনা আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে, ২১ ফেব্রুয়ারি আমরা যে সভা করব এবং ১৪৪ ধারা ভাঙব, এর পোস্টার ফজলুল হক হলের ই/১৮ নং কামরার (গাজীউল হক এ রুমে থাকতেন) মেঝেতে বসে গাজীউল হক সাহেব স্বহস্তে লিখেছিলেন। পোস্টারগুলো দেয়ালে লাগিয়ে দেওয়া হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি সকালবেলা ঢাকা শহরের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা স্রোতের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে সমবেত হতে থাকে। সেদিন অনেক ছাত্রীও সেখানে এসেছিল; ইতিপূর্বে কোন সভা-সমিতিতে এমন ছাত্রী সমাবেশ দেখা যায়নি (আলীম, ২০১৯)।

জিল্লুর রহমান আরো লিখেছেন:

> শেষপর্যন্ত আমাদের সিদ্ধান্ত হল যে, একসাথে গেলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে, গুলি ছুড়ে আমাদের নাস্তানাবুদ করে দেবে। আমরা অ্যাসেম্বলী হাউজে পৌঁছাতেই পারব না। আমরা সেসময় খবর

> পেয়েছিলাম যে আইয়ুব খান অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি বাহিনী নিয়ে অ্যাসেম্বলী হাউজের পেছনে অবস্থান করছেন। আমরা শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম যে, পাঁচজন করে গেট দিয়ে বেরিয়ে অ্যাসেম্বলী হাউজের (বর্তমান জগন্নাথ হল) দিকে যাবো। সকলেই এ প্রস্তাব মেনে নিল। পাঁচজন ছাত্রী গেট দিয়ে বেরিয়ে সেদিকে চলে গেল। আমরা প্রথমে মেয়েদের পাঠিয়েছিলাম একথা ভেবে যে, তাদের গায়ে চট করে হাত দেয়ার সাহস পুলিশ পাবে না। তাছাড়া তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর থেকে পুলিশের দিকে ইট পাটকেল ছোঁড়া হচ্ছিল। তারাও আমাদের লক্ষ্য করে চত্বরের ভেতরে টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করছিল। একটা খণ্ডযুদ্ধই চলছিল তখন (আলীম, ২০১৯)।

ভাষা আন্দোলনে যুক্ত থাকায় জিল্লুর রহমানও রাজরোষে পড়েছিলেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। সে-সময় বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নানা সভা-সমাবেশ হতো, যা সরকারের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু জিল্লুর রহমানসহ কিছু ছাত্রনেতা সভা-সমাবেশ না করা বিষয়ক প্রশাসনের কালাকানুনকে তোয়াক্কা করেননি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জিল্লুর রহমানসহ ১০ জনকে বহিষ্কার করে এবং প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তিনমাস ধরে নানা প্রতিবাদ, ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে অবশেষে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে ডিগ্রি ফেরত দিতে বাধ্য হয় (আলীম, ২০১৯)।

আনোয়ারা খাতুন (১৯১৭-১৯৮৮)

১৯৪০-৪১ শিক্ষাবর্ষে আনোয়ারা খাতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হন। এ বিভাগের প্রথম মুসলমান ছাত্রী তিনি। ১৯৪২ সালে ইতিহাস বিষয়ে তিনি এমএ ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য মনোনীত হয়ে বীণা দাশ, নেলী সেনগুপ্তা, হাসনে আরা বেগম ও আশালতা সেন প্রমুখের সাথে একত্রে নানা রাজনৈতিক কাজে যুক্ত হন (চক্রবর্তী, ২০০৬)। পরবর্তীকালে তিনি পূর্ব-বাংলার আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় আনোয়ারা খাতুনের যে ভূমিকা ছিল, তা বাংলাদেশের নারীর ইতিহাসে চিরকাল দেদীপ্যমান থাকবে। বাংলাভাষা প্রশ্নে পাকিস্তান গণপরিষদের সিদ্ধান্ত এবং এ প্রসঙ্গে সরকার ও সরকারি দলের মারমুখী আচরণের প্রতিক্রিয়ায় ভাষা আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এই পরিষদের প্রতিষ্ঠালগ্নে অনুষ্ঠিত সভায় আনোয়ারা খাতুন যোগ দিয়ে বাংলা ভাষার পক্ষে নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করেছিলেন (চক্রবর্তী, ২০০৬)। আনোয়ারা খাতুন সম্পর্কে গাজীউল হকের লেখায় উল্লেখ আছে:

> ২রা মার্চ তারিখে ফজলুল হক হল মিলনায়তনে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে যোগ দেন 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ', 'তমদ্দুন মজলিস', 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ', বিভিন্ন হলের ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং প্রগতি লেখক সংঘ ও অন্যান্য যে সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল, তাদের প্রতিনিধিগণ। যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন, যতদূর মনে পড়ে, তাঁরা হলেন– শামসুল আলম, শওকত ভাই, তোয়াহা সাহেব, তাজউদ্দিন, শহীদুল্লাহ কায়সার, লিলি খান, কাজী গোলাম মাহবুব, নঈমুদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, আনোয়ারা খাতুন (হাফিজ, ২০১৭)।

এ থেকে প্রতীয়মান হয়, পাকিস্তানের জন্মের অব্যবহিত পর মুসলিম একটি পরিবার থেকে এসে আনোয়ারা খাতুনের দুঃসাহসিক কর্মতৎপরতা সেদিন সকলকে বিস্মিত না করে পারেনি। আনোয়ারা খাতুন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে রইলেন। এরপর ১৩ই মার্চ অনুষ্ঠিত পরিষদের উপকমিটির বৈঠকেও

উপস্থিত ছিলেন আনোয়ারা খাতুন। ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনা শুনে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন। সে-সময় আইন পরিষদে অধিবেশন চলছিল। তখন তিনি স্পিকারকে বারবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনের আহ্বান জানান। একপর্যায়ে আনোয়ারা খাতুন অধিবেশন বর্জন করে এবং কয়েকজন পরিষদ সদস্যকে সাথে নিয়ে পরিষদ ভবন ত্যাগ করে বাইরে অপেক্ষমাণ ছাত্র-জনতার সামনে মিলিত হন। এরপর তিনি ভাষা আন্দোলনে গ্রেপ্তারকৃতদের অবস্থা জানতে এবং তাঁদের মুক্তিদানের জন্য আইন পরিষদে কয়েকবার প্রশ্ন উত্থাপন করেন (চক্রবর্তী, ২০০৬)।

সেদিনের ঘটনা ও পরিষদ ভবনের সদস্যরূপে আনোয়ারা খাতুনের ভূমিকা সম্পর্কে জানা যায়:

> ২১ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের কাছাকাছি ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে যোগদানের জন্য সভার সদস্যরা পরিষদভবনে যখন উপস্থিত ছিলেন সেই সময়েই ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষণ করা হয়। গুলীর আওয়াজ সেখান থেকেও শোনা যায়। গুলীর কিছুক্ষণ পর ছাত্ররা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণের যেদিকে পরিষদ ভবন অবস্থিত সেদিকে সমবেত হয়ে পরিষদ সদস্যদেরকে বাইরে বের হয়ে আসার জন্য চিৎকার করে আহ্বান জানাতে থাকে। এসময় পরিষদের অভ্যন্তরেও দারুণ হট্টগোল শুরু হয়।... ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মনোরঞ্জন ধর নূরুল আমীনকে বলেন যে, তাঁর উচিত তৎক্ষণাৎ মেডিক্যাল হাসপাতাল পরিদর্শন করা এবং তারপর পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষদে বিবৃতি দেওয়া। নূরুল আমীন এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় বিরোধী পক্ষীয় সদস্যগণ সেদিনের মতো অধিবেশন স্থগিত রাখার দাবী রাখেন। কিন্তু নূরুল আমীন বিরোধী পক্ষের দাবী অগ্রাহ্য করে নিজের বিবৃতি দিতে শুরু করলে পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে পরিষদের অধিবেশন বর্জন করে মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আনোয়ারা খাতুন এবং আলী আহমদ খান পরিষদ ভবন পরিত্যাগ করে বাইরে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত হন (মাহবুবউল্লাহ, ২০০৮)।

ড. পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্তী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের মেধাবী ছাত্র ও প্রথিতযশা শিক্ষক ড. পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্তী। রাজনীতির ক্ষেত্রে পৃথ্বীশচন্দ্র ছিলেন একজন ভিন্নধর্মী ব্যক্তিত্ব। বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য বা প্রকাশ্য সমর্থক ছিলেন না তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির সাথেও ছিল না সক্রিয় সংশ্রব। তবে রাজনীতির ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব দর্শন ছিল। রাজনীতি বলতে তিনি বুঝতেন স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ। স্বদেশের প্রতি ও এ জাতির প্রতি অকৃত্রিম দরদ ও ভালোবাসা ছিল তাঁর জীবনাদর্শের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে তিনি ছিলেন সদা সজাগ। রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের নিকট শ্রেণিকক্ষে তিনি তাঁর পক্ষপাত, অবিচল ও অটল সমর্থন নিয়ে কথা বলতেন।

ভাষা আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট মনে করে ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে পুলিশ জন-নিরাপত্তা অধ্যাদেশ বলে পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্তীকে আটক করে। উল্লেখ্য, এ-সময় তিনি ইতিহাস বিভাগে রিডার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও জগন্নাথ হল ছাত্রাবাসের প্রাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ভাষার প্রশ্নে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর পক্ষপাতের কারণে তাঁকে রাজরোষের শিকার হতে হয়। ১৫ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত তিনটি অভিযোগের মধ্যে একটি ছিল তিনি ১৯৪৮ সালের ২৪শে মার্চ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ প্রদত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন বক্তৃতাকে হিটলারের বক্তৃতার সাথে তুলনা করেছেন। পৃথ্বীশচন্দ্র না কি আরো বলেছেন যে, পাকিস্তানের কাশ্মীর দাবি অসমর্থনীয় এবং পাখতুনিস্থানের দাবি যুক্তিযুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগের উত্তরে জানান যে, এরূপ মন্তব্য সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে সত্য, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য নেই। পরে অবশ্য জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তারকাণ্ডকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে কর্তৃপক্ষ তাঁকে অপসারণের পথে অগ্রসর হয়। উল্লেখ্য ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের জন্য সমবেত ছাত্র-জনতার উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এ ঘটনায় ২৫শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক গ্রেফতার হন। তাঁরা হলেন, ড. পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্তী, মুনীর চৌধুরী ও ড. মুজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী। ২৫শে ফেব্রুয়ারি রাতে জননিরাপত্তা আইনে ড. পৃথ্বীশচন্দ্র তাঁর বাসা থেকে গ্রেফতার হন। ১৫ই মার্চ ১৯৫২ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নেয়:

> Dr. P. C. Chakravarti, Reader in History, temporary honorary reader and acting Head of the department of International Relations and provost, Dacca Hall, be placed under suspension with effect from the date of arrest under public safety ordinance. (Record Room, DU).

মার্চ মাসের শেষ দিকে ড. পৃথ্বীশচন্দ্র জামিনে মুক্ত হন। কিন্তু ইতোমধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্র, সরকার ও সরকার-অনুগত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলে আলোচনা। শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারি নির্দেশে ড. পৃথ্বীশচন্দ্রকে কেন চাকরিচ্যুত করা হবে না, তা জানতে কৈফিয়ত তলব করেন। আসলে এ কৈফিয়ত তলব ছিল তাঁর বিরুদ্ধে স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার তৎপরতার অংশ। এরকম রাজরোষ তথা নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেতে তখন তিনি অনন্যোপায় হয়ে উপাচার্যকে লিখেন যে, জননিরাপত্তা আইনে কেউ গ্রেফতার হলেই দোষী প্রমাণিত হয়ে যায় না। উপাচার্যকে লিখিত পত্রে পৃথ্বীশচন্দ্র উল্লেখ করেন:

> Arrest under the public safety ordinance does not establish guilt of any person. You would have been perfectly within your rights to take any action against me if I were convicted by a competent court of law. In fact I was never informed of the grounds of my arrest, if the grounds were communicated to me, I would have been able to prove to the satisfaction of the authorities that I was not guilty of any offense against the state. (Record Room, DU).

এই উত্তর নিয়ে সরকারের ক্রীড়নক বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য করণীয় ঠিক করতে পূর্ব-বাংলার শিক্ষা সচিবের সাথে পত্রালাপ করেন এবং পৃথ্বীশচন্দ্রের নিকট থেকে পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। ড. পৃথ্বীশচন্দ্র ১৬ই এপ্রিল উপাচার্য বরাবর পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেন। এ থেকে সুস্পষ্ট যে, পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্তী শিক্ষাব্রতী হলেও তিনি পরিকল্পিতভাবে কাল্পনিক দেশদ্রোহিতার অভিযোগে রাজরোষে পতিত হন।

উপসংহার

সার্বিক মূল্যায়নে বলা যায়, মহান ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অবদান খুবই উজ্জ্বল। ভাষা আন্দোলনের প্রথম গান রচয়িতা, প্রথম পোস্টার-লিখন, প্রথম ১৪৪ ধারা অমান্য

করে মিছিল করা এ সব কিছুতেই নেতৃত্ব দেন ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থীরা। ’৫২-পরবর্তী সময়ে একুশের চেতনার চর্চা এবং বিস্তারেও তাঁরা সক্রিয় ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলন ও ইতিহাস বিভাগ একসূত্রে গাঁথা। ইতিহাস বিভাগে সূচনাকাল থেকেই একদল মানবতাবাদী, সমাজমুখী, দেশপ্রেমিক ও প্রগতিবাদী শিক্ষার্থী-শিক্ষকের উপস্থিতি ছিল। পাকিস্তানি শাসনের যবনিকাপাত ঘটাতে পূর্ব-বাংলার জনগণ ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল কালপর্বে যে শক্তি সঞ্চয় করেছিল, সে সঞ্চয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের অবদান ছিল বিপুল। ভাষা আন্দোলনে এ বিভাগের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দু’ভাবেই জড়িত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে নতুন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশের সময়েই শাসকগোষ্ঠী যে ‘সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ’ নীতি বাস্তবায়নে তৎপর হয়েছিল, তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ গ্রহণ করেছিল অগ্রণী ভূমিকা।

তথ্যসূত্র

আনিসুজ্জামান। (২০১৫)। *কাল নিরবধি*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

আলীম, ড. এম আব্দুল। (২০১৯)। *ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিব কতিপয় দলীল*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আহমদ, তাজউদ্দীন। (২০১৪)। *তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি ১৯৫১*। তৃতীয় খণ্ড। ঢাকা: প্রতিভাস।

উমর, বদরুদ্দীন। (২০০৮)। ‘ভাষা আন্দোলন’। *মহান একুশে সুবর্ণজয়ন্তী গ্রন্থ* [সম্পা. মাহবুবউল্লাহ]। ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন।

চক্রবর্তী, রতনলাল। (২০০২)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ*। ঢাকা: কল্যাণ প্রকাশন।

চক্রবর্তী, রতনলাল। (২০১৫)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*। প্রথম খণ্ড। ঢাকা: দি ইউনিভার্সাল একাডেমি।

চক্রবতী, ড. রতনলাল। (২০০৬)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী*। ঢাকা: কল্যাণ প্রকাশন।

চক্রবতী, ড. রতনলাল। (২০১০)। *রাজারোষ দুর্ভোগের নবব্যাকরণ*। ঢাকা: দি ইউনিভার্সাল একাডেমি।

দেব, মিলটন কুমার। (২০২৪)। *১৯৭১: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ*। ঢাকা: কথা প্রকাশ।

দেব, মিলটন কুমার। (২০২৪)। *রমেশচন্দ্র মজুমদার: জীবন ও সৃজন*। ঢাকা: দ্যু প্রকাশন।

রেজা, সি এম তারেক। (২০০৪)। *২১ ভাষা আন্দোলনের সচিত্র ইতিহাস*। ঢাকা: নিমফিয়া পাবলিকেশন।

শেলী, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। (১৯৮০)। ‘স্মৃতিচারণ’। *একুশের সংকলন ’৮০*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

সুলতান, আমিনুর রহমান। (২০২০)। *ভাষাসংগ্রামী গাজীউল হক*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

হক, গাজীউল। (২০০০)। *আমার দেখা আমার লেখা*। ঢাকা: মেরী প্রকাশন।

হক, গাজীউল। (২০১৭)। ‘যার যা ভূমিকা’। *আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি* [সম্পা. হাসান হাফিজ]। ঢাকা: অনন্যা।

হোসেন, আশফাক ও ইসলাম, আশা (২০২২)। *শতবর্ষে ইতিহাস বিভাগ : অতীতের আলোয় বর্তমান ও ভবিষ্যত* (সম্পা.)।

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্যক্তিগত ফাইল

Personal file of Dr. P. C. Chakrabory, Record Room, University of Dhaka.
Personal file of Md.Habibur Rahman, Record Room, University of Dhaka.

দৈনিক পত্রিকা

The Amrita Bazar Patrika, 16 March, 1948

প্রথম আলো, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০০২

জাগরণ অনলাইন, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২১